আইনের শাসন আছে আইনের শাসন নাই!

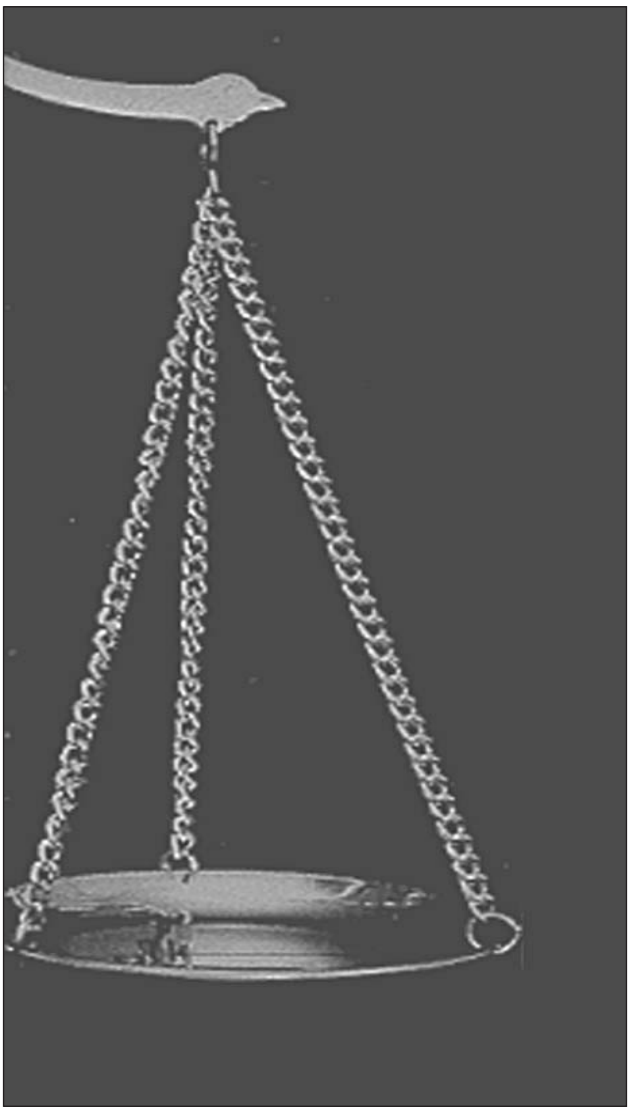

'বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে' বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথাটি মোটামুটি সত্যে পরিণত হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে। ভয়ঙ্কর সব অপরাধীরা নির্বিচারে অপরাধ করে। খুন, ধর্ষণ, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, ডাকাতি করেও বীরদর্পে ঘুরে বেড়ায় বিচিত্র নামের সব অপরাধী। আর্থিক কেলেঙ্কারি, ঘুষ, কমিশন দেয়া-নেয়া এসব যেন মামুলি অপরাধ। আইনের নানারকম ফাঁক গলিয়ে ঠিকই জামিনে বেরিয়ে আসে অসংখ্য অপরাধী। আবারো জড়িয়ে পড়ে অপরাধকর্মে।

মামলা চলতে থাকে। বছরের পর বছর গড়ায়। বিচার প্রার্থী ঘোরে দ্বারে দ্বারে, আদালতপাড়ায় কাটে তার বহু মূল্যবান সময়। অতঃপর এক সময় ক্লান্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। দিতে বাধ্য হয়।

তবে সাম্প্রতিককালে বেশকিছু চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার রায় হয়েছে দ্রুত বিচার আইনে। এই প্রবণতা আশাবাদী করে তুলেছে অনেককেই। বিচার বিভাগের প্রতি আস্থা বাড়ছে। তবে পুলিশের অবস্থা তথৈবচ। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আসামিরা আছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

নৈরাশ্যের পাল্লাটা যথেষ্ট ভারী হওয়ার কারণও আছে।

বড়সড় দুর্নীতির মামলা হারিয়ে যায়। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে স্পর্শকাতর হত্যা মামলাও চলে দায়সারাভাবে।

প্রতিটি অপরাধের দ্রুত বিচারই কাম্য, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় তা খুব জরুরি... **লিখেছেন আরিফুর রহমান**

সনি হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামী ছাত্রদল নেতা সাগর ও টগর

সাবেকুন নাহার সনি। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর এক মেধাবী মুখ। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। বাবা হাবিবুর রহমান টিএন্ডটির ভারপ্রাপ্ত প্রধান রাজস্ব পরিদর্শক। মা সোনালী ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের জুনিয়র অফিসার।

সনিকে নিয়ে বাবা-মায়ের প্রচন্ড আশা। বড় হয়ে প্রকৌশলী হবে মেয়ে, বুক ফুলিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছে সন্তানের সাফল্যের বিষয়ে বলেন তারা।

কিন্তু তাদের সেই আশা ছিনিয়ে নেয় দুই সন্ত্রাসী গ্রুপ।

অন্যদিনের মতো ২০০২ সালের ৮ জুন ক্যাম্পাসে যায় সনি।

তারপর বাকিটা ইতিহাস।

সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন ছাত্রদলের দুই সন্ত্রাসী মোকাম্মেল হায়াত খান মুকি ও মুশফিকউদ্দিন টগর বুয়েটের একটি ঠিকাদারি কাজ নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে আধিপত্য বিস্তারের জন্য বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর তাদের গুলিবিনিময়ের মাঝখানে পড়ে মৃত্যু হয় সনির। বাবা-মা হারান তার সন্তানকে। দেশ হারায় একজন মেধাবীকে।

দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন হয়। বুয়েটে চলে লাগাতার আন্দোলন। সংবাদমাধ্যম হয় সোচ্চার।

অবশেষে গত ২৯ জুন সনি হত্যা মামলার রায় হলো। মূল অভিযুক্ত মুকি, টগরের ফাঁসির আদেশ হয়েছে। তবে মুকি যথারীতি পলাতক। তাকে ধরতে পারছে না পুলিশ।

ঢাকার বিএনপি নেতা হাবিব মন্ডল হত্যাকান্ডের রায় হয় গত ২৫ মে। ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীর, গডফাদার শহিদ কমিশনারের ফাঁসির আদেশ হয় রায়ে। এখানেও যথারীতি অন্যতম অভিযুক্ত কালা জাহাঙ্গীর ধরাছোঁয়ার বাইরে। এদেরকে ধরতে পারলে তবেই সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

'শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র নামের সন্ত্রাসীদের নারকীয় আচরণে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ আর পিতামাতার স্বপ্ন কি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে?'

আইনের নির্ধারিত সীমার মধ্যেই চাঞ্চল্যকর সাবেকুন নাহার সনি হত্যা মামলার রায় দিতে গিয়ে আদালত এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কেমিকৌশল বিভাগের ছাত্রী সনিকে হত্যার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হওয়ায় আদালত মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন

এসব চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দ্রুত হবার পর একটা বিষয়ই প্রমাণিত হয়- সরকার, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাজনীতিবিদরা ইচ্ছা করলেই সম্ভব একটি সুন্দর সমাজ গঠন। সন্ত্রাসমুক্ত দেশের কথা শুধু মুখে না বলে কাজেও দেখানো সম্ভব

ছাত্রদলের সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোকাম্মেল হায়াত খান মুকি ও সহ-প্রচার সম্পাদক মুশফিকউদ্দিন টগরকে। সেই সঙ্গে ফাঁসির আদেশ হয়েছে পেশাদার খুনি নুরুল ইসলাম সাগর ওরফে শুটার নুরুর।

২৯ জুন ঢাকার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক শাহেদ নুরউদ্দিন যখন এ রায় দেন তখন আদালতে ছিল পিনপতন নীরবতা। অসংখ্য মানুষ হাজির ছিলেন চাঞ্চল্যকর মামলার রায় শোনার জন্য।

এই হত্যা মামলার রায় কি হবে তা নিয়ে সব মহলেই নানা আলোচনা ছিল। প্রকৃত বিচার হওয়া নিয়ে ছিল আশঙ্কা। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এর আগের একাধিক মামলার দায়সারা গোছের বিচারের উদাহরণও অনেককে নৈরাশ্যবাদী করে তোলে।

খোদ সনির বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের মনেও আশঙ্কা জন্ম নেয়। আলাপকালে একাধিক সংবাদ মাধ্যমকে তারা একথা বার বার বলেন।

এর সবচেয়ে বড় কারণ ছিল প্রধান দুই আসামির রাজনৈতিক পরিচয়। পাশাপাশি যথেষ্ট সাক্ষ্য- প্রমাণ জোগাড়ের সমস্যা ছিল। আর সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে খোদ মামলার বাদী বুয়েট কর্তৃপক্ষের এক ধরনের অসহযোগিতার মনোভাব ছিল।

ফলে তৈরি হয়েছিল জটিল পরিস্থিতি।

কিন্তু আসল রায়ের পরিস্থিতি যেন আগেই ঠিক করে রেখেছিল সাধারণ মানুষ। নিরীহ একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তুলকালাম হয়েছে বুয়েটে। বুয়েটের ইতিহাসে এমন নজির নেই। তুমুল আন্দোলন হয়েছে বুয়েটের ভেতরে-বাইরে।

তারপর ক্রমাগত বিষয়টি নিয়ে লেগে থেকেছে সংবাদ মাধ্যম। সব মিলিয়ে এক ধরনের চাপ তৈরি হয়েছে সরকারের ভেতর। যা উপেক্ষা করা ছিল কার্যত অসম্ভব এক ব্যাপার।

রায়ে খুশি সনির বাবা-মা।

দুঃখটা হয়তো চিরকালই রয়ে যাবে টিএন্ডটি কর্মকর্তা হাবিবুর রহমান ও সোনালী ব্যাংকের চাকুরে দিলারা বেগমের। একমাত্র মেয়ের অকাল প্রয়াণ তারা কি করে ভুলবেন?

আর তাইতো সেদিন থেকেই উধাও তাদের মুখের হাসি, ২০০২ সালের ৮ জুন যেদিন বুয়েট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী মুকি ও টগর বাহিনীর বন্দুকযুদ্ধের মাঝখানে পড়ে নিহত হয় সনি।

তবু ক্ষণিকের জন্য তাদের মলিন মুখে হাসি দেখা গিয়েছিল ২৯ জুন রায় ঘোষণার পরে। যদিও রায় শুনে ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে কেঁদেছেন পরিবারের সবাই।

প্রিয় সন্তানের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি কামনা করছিলেন। আদালতে উপস্থিত থেকে নিজ কানে শুনেছেন ফাঁসির আদেশ। হাবিবুর রহমান, দিলারা বেগম অপেক্ষা করছিলেন এই দিনটির জন্যেই।

'খুনিরা যেন কোনোভাবেই রেহাই না পায়। প্রত্যেকের এভাবে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা যেন হয়'। আলাপকালে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সঙ্গে এভাবেই নিজের অনভূতির কথা জানান হাবিবুর রহমান। দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এ ধরনের মামলার এরকম রায়ের ধারাবাহিকতাই যেন বজায় থাকে এই আকুতি তার।

সনির মায়ের সোনালী ব্যাংকের চাকরিসূত্রে পাওয়া উত্তরার ৮ নম্বর সেক্টরের সরকারি কোয়ার্টারে এর আগে প্রচুর লোকের ভিড় একবারই ছিল। ২০০২ সালের ৮ জুন, সনি যেদিন মারা যান। রায় শোনার পরে শুভানুধ্যায়ীরা এসেছেন। সাহস জুগিয়েছেন প্রত্যেকে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সনির মা

দিলারা বেগম কখনো হেসেছেন, কখনো কেঁদেছেন। মেয়ের স্মৃতি হাতড়ে বেরিয়েছেন।

অপরাধীর শাস্তি হলেও মেয়েকে কখনোই আর ফিরে পাবেন না স্নেহময়ী পিতা। তাই কিছুটা ক্ষুব্ধ তিনি। হঠাৎই খানিকটা উত্তেজিত হন। বলেন, 'দেশের মেধাবীদের সর্বোচ্চ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও যদি আমাদের সন্তানেরা নিরাপদ না হয় তাহলে ওরা যাবে কোথায়?' শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার তাগিদ দেন হাবিবুর রহমান। আর প্রতিটি হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে সবাইকে সরব হওয়ার অনুরোধ রাখেন।

হাবিবুর রহমান মন্ডল হত্যার দায়ে পুরান ঢাকার সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কথিত ৮৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার সাইদুর রহমান সহিদ ও পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরকে আদালত মৃত্যুদন্ড দেন ২৫ মে

গ্রামের বাড়িতে সনির দাদু খোরশেদা খাতুন রায়ের খবর পেয়েছেন টেলিফোনে। হাবিবুর রহমান জানালেন, খবর শুনে ডুকরে কেঁদেছেন তিনি। বাবা-মা দুজনেই চাকরিজীবী বলে ছোটবেলা থেকেই মূলত দাদীর কোলেপিঠে মানুষ হয়েছেন সনি। আদরের নাতনিকে হারিয়ে সত্তরোর্ধ্ব খোরশেদা বেগম আজও পাগলপ্রায়।

সনির মা-বাবার বিশেষ আকুতি, 'এ দেশের মানুষ যেন স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি পায়'।

সনির বাবার এই আকুতি কি আসলে কোনো কাজে আসবে?

আমরা সেই আশাতেই দিন গুনছি। সাম্প্রতিককালে পুরান ঢাকার বিএনপি নেতা হাবিব মন্ডল হত্যা, সূত্রাপুরের জোড়া খুন, শিশু শিহাব হত্যা, মিরপুরের ফাহিমার আত্মহনন, রুবেল হত্যা মামলার দ্রুত বিচার হওয়ায় এবং আপাতদৃষ্টে আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক সাজার আদেশ একদিকে আসলেই আমাদের আশাবাদী করে তোলে।

কিন্তু বড় বড় দুর্নীতির মামলাগুলো যখন অতলে হারিয়ে যেতে থাকে তখন আবার ভয় হয়। সাবেক স্বৈরাচার এরশাদসহ বিএনপি-আওয়ামী লীগ সরকারের একাধিক মন্ত্রী, সাবেক সচিব, পুলিশ কর্মকর্তাসহ অনেক সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা আছে। কিন্তু দৃষ্টান্তমূলক সাজা হয়নি একজনেরও।

তারপরেও আমরা আশাবাদী যদি ...

সনির হত্যার রায়ে আদালত বলেন, 'এ সমাজ আর কোনো সনির পিতামাতা, ভাই-বোনের বুকফাটা কান্না শুনতে চায় না। সন্ত্রাসীদের বন্দুকযুদ্ধের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ভীত সন্ত্রস্ত দেখতে চায় না। ক্যাম্পাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সন্ত্রস্ত বিচরণ তাদের মেধার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করছে। সনির মতো অপরিণত মৃত্যু কাম্য নয়'- একথা উল্লেখ করে আদালত মনে করেন, আসামিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। পরে জেনেও যদি কেউ কোনো কাজ করে তাহলে তা খুন বলে গণ্য হবে। দন্ডবিধির ৩০১ ধারা অনুযায়ী একজনকে হত্যার উদ্দেশ্যে নিয়ে অন্য কাউকে হত্যা করলে তা খুনের পর্যায়ভুক্ত হবে।

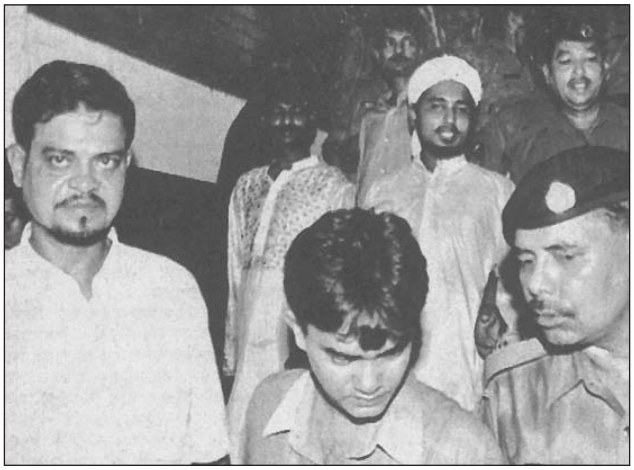

রায় যা দেওয়া হলো : আসামি মুশফিকউদ্দিন টগর ও মোঃ মকবুল হোসেন দোষ স্বীকার করে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে। তাদের সত্য ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বক্তব্যের সঙ্গে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষীদের দেয়া সাক্ষ্যে সমর্থন পাওয়া গেছে। আসামিদের স্বীকারোক্তি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, মুকি ও টগর গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির কারণে সনি নিহত হন।

দন্ডবিধির ৩০০-এর চতুর্থ ধারা অনুযায়ী, মৃত্যু ঘটাতে পারে এমন দৈহিক জখম হতে আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ : গত ২০০২ সালের ৮ জুন দুপুর ১২টা ৫০ মিনিটে বুয়েটের কেমিকেল প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী সাবেকুন নাহার সনি ছাত্রী হোস্টেলে যাচ্ছিলেন। সন্ত্রাসী নুরুল ইসলাম ও টগর এবং তুহিন ও মুকি গ্রুপ অবৈধ সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং আসামিদের স্বীকারোক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আদালত আরো বলেন, গোলাগুলি করে মুকি ও টগরের এক গ্রুপ অন্য গ্রুপের সদস্যদের হত্যা করতে চেয়েছিলো। তারা জানতো যে গোলাগুলির ফলে কারো দৈহিক যখম বা মৃত্যু হতে পারে। ওই গোলাগুলিতেই সনির মৃত্যু হয়। ফলে আসামিরা খুনের দায়ে দোষী। এজন্য আসামিদের দন্ডবিধির ৩০২ ও ৩৪ ধারায় শাস্তি দেয়া হয়।

সনি হত্যাকান্ডে অংশগ্রহণকারী মকবুল হোসেন মুকুল, দুলাল, ইয়ার মোহাম্মদ ওরফে ইয়ার, এস এম মাসুম বিল্লাহ ও পলাতক মাসুমকে দন্ডবিধির ৩০২ (খুন) ও ৩৪ (একই উদ্দেশ্য) ধারায় অপরাধ করায় যাবজ্জীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেয়া হয়। আদালত এদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন। জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে প্রত্যেককে আরো ১ বছর কারাগারে থাকতে হবে। ৭ আসামির বিরুদ্ধে হত্যাকান্ডে জড়িত

থাকার বিষয় প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দিয়েছেন।

আদালতের নিরাপত্তা : চাঞ্চল্যকর সনি হত্যা মামলার রায় উপলক্ষে আদালত প্রাঙ্গণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। এজলাসে সাধারণের চলাচলের ওপর পুলিশ কড়াকড়ি আরোপ করে। বিপুল সংখ্যক উৎসাহী মানুষ রায় শোনার জন্য আদালত এলাকায় জড়ো হন। দুপুর সোয়া ১২টায় আসামিদের কাঠগড়ায় হাজির করা হয়। সাড়ে ১২টায় আদালত রায় ঘোষণা শুরু করেন। রায় ঘোষণার পর আসামি টগর ছিলো ভাবলেশহীন। অন্য আসামিদেরও একইরকম দেখা যায়। খালাসপ্রাপ্ত আসামিদের একজন কান্নায় ভেঙে পড়েন। রায়ে সাধারণ মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

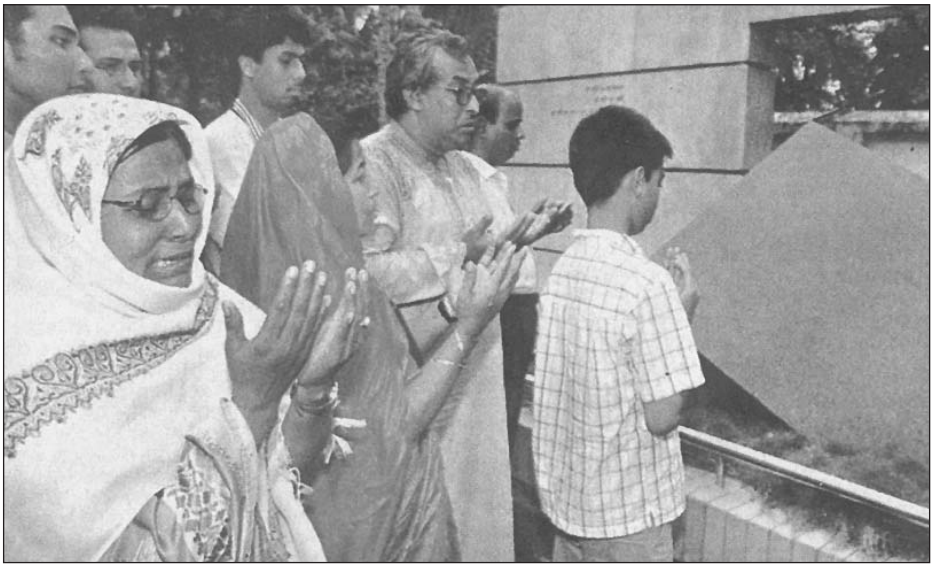

রায় ঘোষণায় পর সনির স্মৃতিস্তম্ভে এসে দু'হাত তুলে কান্নায় ভেঙে পড়েন বাবা-মা এবং ছোট ভাই, খুনির শাস্তি হচ্ছে এইটুকুই তাদের সান্ত্বনা

সারা দেশ কেঁপে ওঠে : ৮ জুন সনি নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে সারা ক্যাম্পাসে শোকের ছায়া নেমে আসে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। সর্বত্র মিছিল, মিটিং, সমাবেশ করে এ ঘৃণ্য হত্যাকান্ডের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদ জানায় ছাত্রছাত্রী তথা সচেতন জনসাধারণ। সন্ত্রাসীদের গুলিতে বুয়েট ছাত্রী নিহত হওয়ার খবরে সারা দেশ কেঁপে উঠেছিলো। টানা দুই মাস বন্ধ থাকে বুয়েট।

সারা দেশে বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন এ হত্যার বিরুদ্ধে সভা, সমাবেশ ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। জাতীয় পত্রিকাগুলো সম্পাদকীয়, মন্তব্য প্রতিবেদন ও বিশেষ প্রতিবেদনের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস এবং এ হত্যাকান্ডের নিন্দা জানায়। ১১ জুন বুয়েটের ছাত্র-ছাত্রীরা সনি হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন।

৯ জুন কর্তৃপক্ষ ৩ জুলাই পর্যন্ত বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। পরে কর্তৃপক্ষ ১১ আগস্ট বুয়েট খুলে দেয়। প্রায় এক মাস খোলা থাকার পর ছাত্রছাত্রীদের অনশনের মুখে ৮ সেপ্টেম্বর বুয়েট আবার বন্ধ হয়ে যায়।

টগরের প্রতিক্রিয়া নেই : কাঠগড়ায় উপস্থিত আসামি টগরের কাছে রায়ের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি সাংবাদিকদের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে অস্বীকৃতি জানান। তবে আসামি পক্ষের আইনজীবীরা বলেন, তারা এ রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করবেন।

রাষ্ট্রপক্ষের বিশেষ পিপি আব্দুল লতিফ তালুকদার বলেন, এ রায়ে তিনি সন্তুষ্ট। দেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের ঘটনায় ছাত্রছাত্রীরা নিহত হলেও তার বিচার হয় না। এ রায়ের মধ্য দিয়ে প্রচলিত এ ধারণার অবসান হলো। শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এ রায় ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি মনে করেন।

বেকসুর খালাস হলো যারা : অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় শেখ সোলায়মান বাবুল, সিরাজুল ইসলাম ওয়াসিম, জাকির হোসেন পাটোয়ারি মুন্না, সুজন, রফিক ওরফে রফিক চাচা, আইয়ুব ও পলাতক আসামি মহিউদ্দিনকে বেকসুর খালাস দেয়া হয়েছে।

রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন বিশেষ পিপি আব্দুল লতিফ তালুকদার। আসামি পক্ষে ছিলেন, সামিউল করিম আলমগীর, হাজী এম জি কুদ্দুস, মোঃ হুমায়ুন কবির মঞ্জু, এ কে এম খলিলুর রহমান, মোহাম্মদ হানিফ, মোহাম্মদ আলী, জাহানারা বেগম প্রমুখ।

গত বছর ৮ জুন সনি নিহত হওয়ার পর সিআইডি ৬ মাস তদন্ত করে এ বছর ১ জানুয়ারি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এস এম আকতারুজ্জামান আদালতে ১৫ আসামির বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন। এ বছর ১৯ জানুয়ারি মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়। ২১ জানুয়ারি ১০ আসামির উপস্থিতিতে আদালত সব আসামির বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেন।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের পটভূমি : কেবল বুয়েটে গোলাগুলিতে সনির মৃত্যু নয়, আদালত তার দৃষ্টির সীমাকে নিবদ্ধ করেছেন দেশের শিক্ষাঙ্গনের সামগ্রিক সন্ত্রাসের পটভূমিতে। আদালত তার রায়ে বলেন, শিক্ষাঙ্গনের সঠিক অবস্থার দিকে আদালতের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। নিজের সীমাকে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করার পক্ষে আদালত বলেন, ৫৩ ডিএলআরে উল্লিখিত বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বে আপিল বিভাগের একটি রায়ে আদালত অভিমত প্রকাশ করেন যে, 'বিচারকদের দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে বিচারকসুলভ মনোভাব নিয়ে বিচার করতে হবে।'

সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনা : আদালত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্যের কারণ খুঁজে বের করার সময় এসেছে। বারো বছর পিতা-মাতার অক্লান্ত পরিশ্রমে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান করে নিয়েছেন। নিহত সাবেকুন নাহার সনির পিতামাতা কলম হাতে তাকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছিলেন। সনির স্বপ্ন ছিলো প্রকৌশলী হয়ে সমাজ, জাতি এবং বিশ্ববাসীর সেবা ও কল্যাণে নিয়োজিত হওয়ার। সন্ত্রাসীদের তান্ডবে তাকে অঙ্কুরে ঝরে যেতে হলো। এ সময় আদালতে রায় শুনতে আসা সনির পিতা-মাতা আহাজারি করে ওঠেন।

হাবিব মন্ডল হত্যা মামলা

বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান মন্ডল হত্যার দায়ে পুরান ঢাকার সন্ত্রাসীদের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে কথিত ৮৩ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার সাইদুর রহমান সহিদ ও

পুলিশের তালিকাভুক্ত শীর্ষ সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরকে আদালত মৃত্যুদন্ড দেন ২৫ মে। নিকট অতীতে কোনো মামলায় ঢাকার দুই শীর্ষ সন্ত্রাসীর ফাঁসির আদেশ হয়নি। নিঃসন্দেহে এটি দ্রুত বিচার আদালতের সাফল্য। এই আদালত না হলে বছরের পর বছর গেলেও বিচার কাজ সম্পন্ন হতো কি-না সন্দেহ।

এ হত্যাকান্ডে সহযোগিতার জন্য তাদের ১৩ সহযোগীকে আদালত যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দেন। মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামি কমিশনার সহিদ রায় ঘোষণাকালে আদালতে এবং অপর আসামি কালা জাহাঙ্গীর পলাতক রয়েছে।

হত্যা ষড়যন্ত্রের মূল পরিকল্পনাকারী কমিশনার সহিদ ও সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরকে মৃত্যুদন্ড ছাড়াও আদালত পৃথক পৃথকভাবে ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩০২ (হত্যা), ১২০ (খ) (ষড়যন্ত্র) এবং ৩৪ (একই উদ্দেশ্য) অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ রায় ঘোষণা করেন।

আসামি সহিদ ২০০০ সালের ২০ আগস্ট অ্যাডভোকেট হাবিব মন্ডল হত্যাকান্ডের সময় দেশের বাইরে ছিলেন। ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসীদের সঙ্গে তার ওঠাবসা, তাদের প্রতিপালন করাই সহিদের কাজ। মোটামুটি এটা স্বীকৃত ছিল যে, সহিদ কমিশনার দেশের বাইরে থাকা মানেই তার এলাকায় খুন হওয়া।

এর আগেও বিভিন্ন সময় অন্তত ১৩টি হত্যাকান্ডের সঙ্গে কমিশনার সহিদ জড়িত ছিলো বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু এসব হত্যাকান্ডের সময় দেশের বাইরে থাকায় মামলায় তাকে আসামি করা হয়নি। হাবিব মন্ডল হত্যার সময়ও কমিশনার সহিদ দেশের বাইরে অবস্থান করছিল। তবে সাক্ষ্য- প্রমাণে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং অন্য আসামিদের অর্থের বিনিময়ে ভাড়া করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর কমিশনার সহিদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

খোদ বিচারক তার পর্যালোচনায় সহিদ সম্পর্কে বলেন, 'আসামি সহিদ কমিশনারের ভয়ে সাক্ষীদের কেউ কেউ দীর্ঘকাল পলাতক ছিলো। পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ঘটনার পরে এ মামলার সাক্ষীরা তাদের জীবনের নিরাপত্তার অভাবে এবং জীবননাশের আশঙ্কায় পুলিশের কাছে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জবানবন্দি দিতে ব্যর্থ হন।'

আদালত তার রায়ে আরো বলেন, যেহেতু হাবিব মন্ডল হত্যার ষড়যন্ত্র ও হত্যার প্রধান আসামি এবং তার সহযোগীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাই আদালত মনে করেন তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। যাতে সমাজে কোনো মানুষের, কোনো বুদ্ধিজীবীর এভাবে জীবন দিতে না হয়। আর যেন হাবিবুর রহমান মন্ডলের স্ত্রীর মতো কারো আহাজারি, বিলাপ শুনতে না হয়।

পাশাপাশি আরো এক শীর্ষ সন্ত্রাসী তনাই মোল্লাসহ নুরুল হক, অপু ওরফে চাকমা অপু, পিচ্চি হান্নান ওরফে হান্নান, কালা শরীফ, সেন্টু, কচি, বিপ্লব ও ডাকাত সহিদের যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়েছে।

এছাড়া এদের প্রত্যেককে আদালত ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন। জরিমানার টাকা দিতে ব্যর্থ হলে তাদের আরো ৬ মাস কারাদন্ড ভোগ করতে হবে। আসামি ওয়ালী মোহাম্মদ, শাহীন ও দীন ইসলাম দীলার বিরুদ্ধে অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাদের বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, বিএনপি সূত্রাপুর থানা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট হাবিব মন্ডলকে প্রায় ৩ বছর আগে তার ১০/১, চন্দ্র মোহন বশাক লেনের বাসার অদূরে ৫/৬ জন অজ্ঞাতনামা যুবক গুলি করে হত্যা করে। ঘটনার সময় তিনি সহযোগী আসাদের সঙ্গে একটি ভ্যাসপায় করে আদালতে যাচ্ছিলেন। আসাদের গায়েও এ সময় গুলি লাগে। এ হত্যাকান্ড সে সময় সারা দেশে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

বিশেষ করে এই হত্যাকান্ডে দেশের সবচেয়ে আলোচিত সন্ত্রাসী কালা জাহাঙ্গীরের নাম আসায় হত্যাকান্ড নতুন মাত্রা পায়।

সহিদ কমিশনার যে আসলেই গডফাদার, রায় ঘোষণার দিনও সেই প্রমাণ দেয় তার সমর্থকরা।

ওই দিন সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সহিদ কমিশনারের ফাঁসির দাবিতে একটি মিছিল আদালত প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে।

ঠিক আধঘন্টা পরে সকাল এগারোটার দিকে সহিদ কমিশনারের মুক্তির দাবি নিয়ে সহিদনগরের বস্তিবাসীর একটি মিছিল জেলা ও জজ আদালতের পশ্চিমে ঢাকা আইনজীবী সমিতির প্রবেশমুখের পাশে অবস্থান নেয়। তারা আদালত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়।

এ সময় শাঁখারিবাজারের দিক থেকে হাবিব মন্ডলের সমর্থকদের মিছিলটি রেবতি ম্যানশনের সামনে আসে। উভয় গ্রুপের মধ্যে এ সময় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। দু'পক্ষের লোকজনই জজকোর্ট মসজিদের কাজের জন্য ব্যবহৃত ইট নিয়ে পরস্পরের দিকে বৃষ্টির মতো ছুঁড়তে থাকে। মুহূর্তে আদালত প্রাঙ্গণ ও আশপাশের এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। এ সময় রাস্তার দু'পাশের দোকানপাট এবং যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তবে আদালত প্রাঙ্গণে আগে থেকেই মোতায়েন করা দাঙ্গা পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠিচার্জ করে। প্রায় ১৫ মিনিট সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ইটপাটকেলের আঘাতে পুলিশ কনস্টেবল হারুনসহ কয়েকজন আহত হন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কবির হাসান ও সহিদ নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে।

সনি হত্যাকান্ডে মুকি ও টগরের সম্পৃক্ততা প্রমাণ হয়েছে আদালতে। লেখাপড়া করতে এসে বিপথগামীদের কেউ কেউ যে কতটা সর্বনাশের কারণ হতে পারে তাদের দু'জন তার

১৩ বছরের কিশোরী ফাহিমাকে ধর্ষণ এবং এ কারণে লজ্জা-ঘৃণায় তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া মামলায় প্রধান অভিযুক্ত সুমনের ফাঁসি হয়

প্রমাণ।

বুয়েট ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের কাছে এই দুই নাম গত কয়েক বছর ধরে আতঙ্ক ও ভয়ের উৎস হয়ে আছে।

বুয়েট থেকে 'ধাতব কৌশলে' স্নাতক পাস করার পর স্রেফ চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজির জন্য নামকাওয়াস্তে মাস্টার্সে ভর্তি হয়েছিল মুকি। একই সংগঠনের সাবেক এক শীর্ষ নেতার আশীর্বাদে বুয়েটের আশপাশের এলাকায় সে গড়ে তুলেছিল চাঁদাবাজির এক বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকাতে না পারলেও দীর্ঘদিন এসএম হলের একটি কক্ষ জবরদখল করে রেখেছিল টগর। মুকির মতো সেও সাবেক এক ছাত্রদল নেতার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয় ও সংলগ্ন এলাকার সামনে চাঁদাবাজি আর টেন্ডারবাজির নেতৃত্ব দিত। পরিচালনা করতো দুর্ধর্ষ এক সন্ত্রাসী বাহিনী।

বুয়েটের শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট আরো অনেকের সঙ্গে আলাপকালে জানা যায়, জোর করে রশীদ হলের এক কক্ষ দখল করে সেটিকে প্রতিপক্ষ নির্যাতনের কেন্দ্র বানিয়েছিল মুকি।

টগরের ছিল বিচিত্র সব অস্ত্র দখলের নেশা। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্যাডারের কাছে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যম হিসেবেও কাজ করতো সে। মুকি ও টগরের ঘনিষ্ঠজন ও পুলিশের সূত্রে তাদের অপরাধ জগৎ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যায়। রশীদ হলের ১০১২ নম্বর কক্ষে ছাত্রলীগের ডলার, সোহাগ, মনির, বাবুল, তাপসসহ বেশ ক'জন শিক্ষার্থী তার নির্যাতনের শিকার হয়।

মুকির দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধেও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অভিযোগ আছে। বড় ভাই সেকেন্দার হায়াত খান ৪৩ বছর বয়সে এখনো চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্র। যার বড় ছেলে ও-লেভেল পাস করেছে। সেকেন্দার খান ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম মেডিকেলে তিন খুনের সঙ্গে জড়িত।

পরিবারের চতুর্থ ছেলে কামাল হায়াত খান ৬ বছর আগে বন্ধু মোশাররফ হত্যা মামলায় জড়িয়ে বিদেশে পাড়ি জমায়।

গত বছরের ৬ আগস্ট বুয়েটের বোর্ড অব রেসিডেন্স অ্যান্ড ডিসিপ্লিনারি কমিটি বন্দুকযুদ্ধে সম্পৃক্ততার কারণে মুকিকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আজীবন বহিষ্কার করে। ১ জানুয়ারি সনি হত্যার চার্জশিটে মুকির নাম আসে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে টগরের সহযোগীদের সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রদল-ছাত্রলীগ বন্দুকযুদ্ধ হলে প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে টগরের নাম আলোচনায় আসে। ওই যুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতা পার্থ প্রতিম

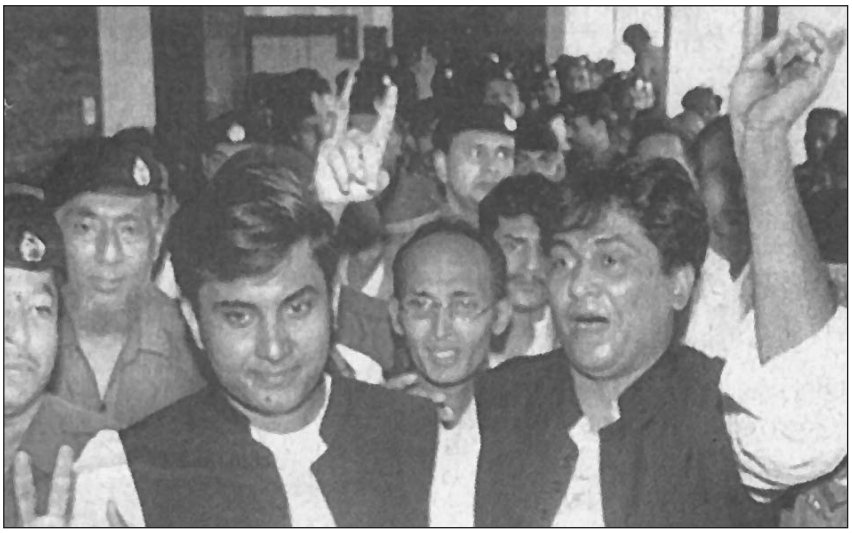

গেন্ডারিয়া রাইফেলস ক্লাবে জোড়া খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুই সহোদরের ফাঁসি ঘোষণার পর তারা জয় বাংলা স্লোগান দেয়

আচার্য খুন হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্যাম্পাস ছাড়ে টগর। গ্রামে গিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে চরমপন্থীদের সঙ্গে। বেশ কিছুদিন পর আবার ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। এরপর থেকে টগর ক্যাম্পাসে অস্ত্র ব্যবসার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে বলে জানা যায়।

ছাত্রদলের শীর্ষ নেতার পছন্দে ২০০০ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-প্রচার সম্পাদকের পদ পায় সে। এতে বেপরোয়া হয়ে ওঠে সে; চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি চলে সমানে। লেখাপড়ায় অনিয়মিত হয়েও অবস্থান করে সলিমুল্লাহ হলে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর সলিমুল্লাহ হল দখলে প্রকাশ্য অস্ত্রের মহড়া হয়।

এ সময় পলাশী বাজার, নীলক্ষেত, নিউমার্কেটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টগর চাঁদা আদায় করতো। এর ভাগ যেতো সদ্য সাবেক হওয়া ছাত্রদলের শীর্ষ নেতাটির কাছেও। প্রায় দুই বছর ধরে বুয়েট ক্যাফেটরিয়া দখল করে রেখেছিল টগর বাহিনী। এ নিয়ে মুকি গ্রুপের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই তাদের সংঘর্ষ হতো।

তবে উভয় গ্রুপে সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ হয় ২০০২ সালের ৮ জুন। সেদিন তাদের বন্দুকযুদ্ধের মধ্যে পড়ে নিহত হন সনি।

বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো মামলায় দ্রুততম বিচারের অনন্য নজির স্থাপন হয় শিশু বাপ্পী হত্যা মামলায়। নারকীয় এ হত্যাকান্ডের সাড়ে পাঁচ মাস পর গত বছরের শেষ দিকে রায় হয়।

বাপ্পী হত্যার দায়ে তার খালাতো ভাই শিপনসহ ৫ আসামিকে আদালত মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন।

আড়াই বছর আগে ঢাকার গেন্ডারিয়ায় চাঞ্চল্যকর জোড়া খুন ও হত্যার পর নিহতদের লাশ ৬ টুকরো করে ম্যানহোলে লুকিয়ে রাখার দায়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী ও সাবেক ওয়ার্ড কমিশনার নসিবুন আহমেদের ছেলে রাহিদ হাসান সুমন ও সাজিদ হাসান সুজনসহ ১৬ জনকে আদালত মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেন।

মিরপুর টোলারবাগে ১৩ বছরের কিশোরী ফাহিমাকে ধর্ষণ এবং এ কারণে লজ্জা-ঘৃণায় তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়া মামলায় প্রধান অভিযুক্ত সুমনের ফাঁসি হয়।

এসি আকরামসহ পুলিশের ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী পরস্পরের যোগসাজশে এবং সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে অমানবিক ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে বলে বিচারে প্রমাণিত হয়। এ কারণে আদালত তাদের প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করেন।

স্পর্শকাতর এই হত্যা মামলার রায়ে এটুকু আশা করাই যায়, বিচার বিভাগ ইচ্ছে করলে বছরের পর বছর বিচারপ্রার্থীকে অপেক্ষা না করিয়ে তাদের কাজ সমাধা করতে পারে।

অনেকে অবশ্য এজন্য সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছার কথা বলবেন। পুলিশি তদন্ত ভালোভাবে হওয়া এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ঠিকমতো দেয়ার বিষয়টি তো আর আদালতের ওপর নির্ভর করে না। পুলিশ ঠিকমতো তার কাজ করলে বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে যায়।

এসব চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দ্রুত হবার পর একটা বিষয়ই প্রমাণিত হয়- সরকার, রাষ্ট্রযন্ত্র, রাজনীতিবিদরা ইচ্ছা করলেই সম্ভব একটি সুন্দর সমাজ গঠন। সন্ত্রাসমুক্ত দেশের কথা শুধু মুখে না বলে কাজেও দেখানো সম্ভব।